কবি শামসুর রাহমানের গণমানুষ চেতনা
(Poet Shamsur Rahman's Awareness about Mass People)

শুকদেব চন্দ্র মজুমদার[১]

[1]*Dr. Shukdev Chandra Majumdar is a Professor in Bangla, Bangladesh Civil Service (Education) and Vice Principal, Bakerganj Government College, Barishal, e-mail: gov.bakerganjcollege@gmail.com*

Abstract
In brief, it can be said that the social commitment, the feelings of responsibility for making the satisfactory relationship among people, fine sensibility and feelings of humanity, love for good and hatred towards evil made Shamsur Rahman sensible of the general people- the masses (gaṇomānuṣ) expressed especially through a great number of poems in various ways. A portion of his poetic entity can be easily identified with his concern for their warp and woof, weal and woe, and other stories and strugglings. His concern for homeless people, helpless people, village people, peasants, minority people, labourers and general professionals has been illustrated with feelings filling up the thinking that there has always been a mattter of sensibility and responsibility to him on the ground of the distress of the humankind. Like this, his conciousness, emotion and anger have grown and gotten deeper in the course of drawing the picture of the city's decadence, class discrimination, origination of the new plunderer class and disorder after the independence, the fatigued fate of the general people due to the origination, and the events and related persons and classes connected with historical movements of Bangladesh. This essay is intended to discuss all the above-mentioned things elaborately.

Key Word: শামসুর রাহমান, গণমানুষ, গণমানুষ চেতনা

ভূমিকা
শহুরে আধুনিক কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) প্রভাবসূত্রে জীবনানন্দ দাশ-বুদ্ধদেব বসু বলয়ের বাসিন্দা ছিলেন, যেখানে গণমানুষ চেতনা, সমকাল ভাবনা ইত্যাদির প্রকোপ ছিলো না বললেই চলে। মনোবিশ্বের বিপুল শস্য ফলানোয় কোনো প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টিকে সেখানে কখনো সুনজরে দেখা হতো না। এমনি প্রেক্ষাপটেই 'রুপালি স্নান' সেরে উঠে আসা শামসুর রাহমান বেশ কিছুকালই ছিলেন সে স্নান ও সংশ্লিষ্ট সমুদ্রের স্বপ্নে বিভোর; সেখান থেকে 'আফ্রোদিতি'র উঠে আসাকে তখন তিনি স্বাগত জানান। কিন্তু লোকালয়ে সমাগত আফ্রোদিতির আক্রান্ত হওয়া তাঁকে উদ্বিগ্ন করে, এবং তাই তিনি মনঃস্থ করেন- উদ্ধার করতে হবে তাকে, বাস্তবতা পীড়িত লোকালয়ে যেতে হবে, ভিড়তে হবে মানুষের ভিড়ে।[১] তাই অনেক আবেগ-কল্পনা-সৌন্দর্যের অনুরণন বদ্ধমূল বিশ্বাসের মতোই বুকে চেপে রেখেও ছুটে যান তিনি শরণার্থী সমাকীর্ণ রেলওয়ে ওয়াগনের কাছে বা বস্তিতে, হাতুড়ি ছেনি হাতে বিটকেল ইট-পাটকেল ভাঙছে যারা- তাদের কাছে, মে-দিনের গান তিনি গান গলা খুলে। সূর্যাবর্ত-এর মতো আবর্তে ঘোরেন তিনি সমকালের পরতে পরতে; বায়ান্ন, বাষট্টি, ঊনসত্তর, সত্তর, একাত্তর, নব্বুই ইত্যাদিকে তিনি চয়ন করে চলেন, দ্যোতনা দিতে থাকেন দায়িত্বপূর্ণভাবে। ল্যাজারাসের মতো এ জাগরণ তাঁর, যাঁর চোখে ধরা পড়ে প্রতিবেশের রূঢ় আদল, যা তাঁকে কখনো দেশদ্রোহী হতে উদ্বুদ্ধ করে বা বিশেষ ক্ষোভ ও প্রতিবাদমুখর করে তোলে, যা আসলে তাঁর দেশপ্রেমরই রূপাশ্রিত, যে রূপের মধ্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দ্রোহের অনেকটা রূপ দ্যুতি পায়।[২] শামসুর রাহমানের এক সাক্ষাৎকারের কথা এখানে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন এটা ঠিক এবং গণ-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত গণমানুষের কবিতার পথপ্রদর্শক তো নজরুল ইসলামই।"[৩] শামসুর রাহমানের কবিতায় চিলির কবি পাবলো নেরুদা, ফ্রান্সের কবি লুইস আরগঁ, স্পেনের কবি লোরকা, বাংলাদেশের কবিয়াল রমেশ শীল প্রমুখের একাধিকবার উল্লেখ, এমনকি তাদের কাউকে-কাউকে নিয়ে কবিতা রচনা, আর্জেন্টিনার মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারা, দক্ষিণ আফ্রিকার মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা ও বাংলাদেশের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধার্পণমূলক পঙ্‌ক্তিমালা রচনাদিও তাঁর সাম্যবাদী ও বিপ্লবী চেতনা সংশ্লিষ্টতাকে ইঙ্গিত করে, যে ইঙ্গিত স্বভাবতই দিক নির্দেশ করে তাঁর গণমানুষ চেতনার প্রতি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের টগবগে তরুণ নূর হোসেনকে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতার কথা। 'গর্জে ওঠো স্বাধীনতা' কবিতায় তিনি নূর হোসেনের দোহাই দিয়েছেন এভাবে- "বীর যুবা নূর হোসেনের শাহাদাতের দোহাই"।[৪] নূর হোসেন একজন গণমানুষ বা আপামর জনসাধারণভুক্ত মানুষ। যে অর্থে লিখেছেন তিনি তাঁর 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থ, যে অর্থে তিনি অভিহিত হয়েছেন 'স্বাধীনতার কবি' হিসেবে, সে অর্থেও তাঁর ওই চেতনার স্বরূপের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। সে চেতনার পেছনে রয়েছে অনেক ইতিহাস, রয়েছে তার অনেক প্রকাশ। সে প্রকাশের বহুলাংশেই তিনি বাংলাদেশ-পরিসরের, কিন্তু কখনো তিনি কতকাংশে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছেন। এসব হওয়া সম্ভব হতো না যদি না তিনি অর্ফিয়াসের মতো আজীবন বাঁশি বাজাতেন, ফিনিক্স পাখির মতো বারবার বেঁচে ওঠার

সাধ মনে ধারণ করতেন, এবং 'সত্তাসূর্যে যেসাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে' উজ্জ্বল কথার মিছিল গড়তেন। সে কথায় সাধারণ মানুষ বা গণমানুষের জন্যে সুন্দর বসবাসযোগ্য একটি দেশ, একটি পৃথিবীর জন্যে, মানবতার বিজয়োৎসবের জন্যে তাঁর সাধ উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি যখন বলেন, "সমাজের সকল মানুষের জীবনযাত্রা আনন্দপ্রদ, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ হোক, এটা আমার আন্তরিক কামনা ছিল," তখন ওই সাধের যৌক্তিকতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয়।[৫] এ প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি বক্তব্য স্মরণীয়; বক্তব্যটি হলো:

> Others have raised the question whether it is enough for the poet to be committed only to the production of genuine poetry. To put it differently, could there be a poet without any commitment to society whatsoever, for clearly, no poet could be without a sense of good and evil. Social issues have been a matter of concern to all poets.[৬]

শামসুর রাহমানের গণমানুষ চেতনা এ প্রেক্ষাপটেই বিচার্য- বর্তমান আলোচনায় যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, যার মৌল উদ্দেশ্য হলো সে চেতনার স্বরূপ উন্মোচন ও বিশ্লেষণ।

গণমানুষ ও গণমানুষ চেতনা

গণমানুষ (gaṇomānuṣ) শব্দটি সমাসবদ্ধ পদ, অনেকটা কাগজপত্র-এর মতোই। 'গণ' অর্থ জনগণ, জনসাধারণ বা জনমানুষ; যে-কোনো অর্থেই একটি বহুবচনবাচকতা রয়েছে। উল্লেখ্য, গণ-এর আর কয়েকটি অর্থ হলো বর্গ, শ্রেণি, দল ও গোষ্ঠী, যেগুলোর প্রত্যেকটিতেই বহুত্বের অর্থ নিহিত।[৭] ইংরেজিতে 'গণমানুষ' হলো 'Mass'; তবে যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন 'The masses' বা 'Masses' হয়। আবার বিশেষ কোনো শব্দগুচ্ছে বা বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হলে 'Mass' আকারে বসে, যেমন, Mass media (গণমাধ্যম)। ইংরেজিতে Mass-এর একটি অর্থ হলো: 'The great body of the people as contrasted with elite'- যার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য এমন একটি বিষয় রয়েছে যা 'গণমানুষ' বলতে বর্তমান লেখক যা বোঝাতে চেয়েছেন তার সাথে সংগতিপূর্ণ।[৮] বিষয়টি 'as contrasted with elite'- এ শব্দগুচ্ছের মধ্যে নিহিত; যা স্পষ্টত হলো, সমাজ-রাষ্ট্রে সাধারণত যাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক বলা হয়, বা যারা ক্ষমতাবান, অর্থবান বা বিশেষ সুবিধাভোগী তাদেরকে 'Mass' বা 'গণমানুষ' ভুক্ত করা যায় না, পৃথক শ্রেণির তারা।

'চেতনা'র বহুল ব্যবহৃত সমার্থক শব্দ 'চৈতন্য,' যার স্থুল শারীরবৃত্তীয় বা চিকিৎসা বিজ্ঞানগত অর্থ : জীবিত অবস্থা, জাগ্রত অবস্থা, জীবন, হুঁশ, সংজ্ঞা ইত্যাদি। আর শব্দটির ইংরেজি অর্থ অন্বেষণ করতে গেলে প্রথমেই যেটি মনে আসে সেটি হলো 'Consciousness' (the state of being aware of and responsive to one's surroundings)। শব্দটির মন-চিন্তন-অনুভূতিগত ও অনেকটা সাহিত্যিক অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা যায় জ্ঞান, সচেতনতা, অনুভূতি ও সংবেদনশীলতাকে; এর সঙ্গে বড়োজোর নেয়া যায় চিন্তা, ভাবনা ও ধারণা- এ তিনটি শব্দকে। অর্থগুলো সবমিলিয়ে 'চেতনা'র অর্থ সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করে তাই সহায়ক 'গণমানুষ চেতনা'র অর্থ বুঝতে। অতএব, শামসুর রাহমানের গণমানুষ চেতনা হলো: গণমানুষ সম্পর্কে শামসুর রাহমানের জ্ঞান, সচেতনতা, অনুভূতি, সংবেদনশীলতা ইত্যাদির একটি সম্মিলিত রূপ।

শামসুর রাহমানের গণমানুষ চেতনার সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা

একদিন 'শুধু দু'টুকরো শুকনো রুটির নিরিবিলি ভোজ অথবা প্রখর ধু-ধু পিপাসার আঁজলা-ভরানো পানীয়ের খোঁজ' তিনি নিতে চাননি, চেয়েছিলেন সোনালি আল্পনাময় অপরাহ্ণ, স্বর্গ-শিশির ইত্যাদি, এবং তাই পেয়েই তিনি সম্রাট হতে চেয়েছিলেন; তারপরেও তিনি নোনাধরা মৃত ফ্যাকাশে দেয়ালে প্রেতছায়া দেখেছিলেন, দেখেছিলেন তাঁর দরজায় অনেক বেনামি প্রেতকে ঠোঁট চাটতে। এ দর্শনশক্তিই পরবর্তীকালে বহুল পরিমাণে সমাজ মানুষ দেশ ও কাল লগ্ন করে তাঁকে। নিজের স্বপ্নময়তার জন্যে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে তিনি একদিন পেরেছিলেন বটে, কিন্তু যিনি 'সত্তাসূর্যে যেসাসের ক্ষমা' মেখে উজ্জ্বল কথার মিছিল গড়তে চান তিনি কতোদিন আর সমাজ বা গণমানুষবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেন? অর্থাৎ মানবিক সত্তাটি প্রথমত তাঁকে গণমানুষলগ্ন করেন- এমন ভাবা যায়। অতঃপর তাঁর সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠার প্রাথমিক কাল, যেখান থেকে তাঁর গণমানুষ চেতনা সমৃদ্ধ হতে ও স্থায়ী একটি রূপ পেতে শুরু করে। ১৯৫২ সালের আগে থেকেই সে সমাজ-রাজনীতি মনস্কতার সূচনা বললে অযৌক্তিক হবে না কিছু ঐতিহাসিক বা তথ্যগত কারণেই। স্মরণ করা যায় এ প্রসঙ্গে কবির বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিকের লেখা 'কয়েকটি দিন : ওয়াগনে' কবিতাটির কথা। গণমানুষের ভাবনা অমন করে ফুটে উঠতো না ওই বয়সে যদি না তার মধ্যে একটি গণমানুষমুখী মন থাকতো, বা মানবতার শিক্ষা ও অনুভূতি ততোদিনে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করতো। কবিতাটির প্রথম দিকের কিছু অংশ এমন:

> অচিন শহর। ভিন্ন জীবন। নতুন মুখ।
> ধোঁয়াটে মনের স্যাঁতসেঁতে কোণে নড়ছে মাছি,
> বোনের কান্না! বৃদ্ধ পিতার ভীষণ কাশি!
> বিষণ্ন দিনে সহসা তাকাই: কোথায় আছি?[৯]

১৯৫২-এর কাছাকাছি কোনো এক সময়ে লেখা 'আর যেন না দেখি,' ১৯৫৮ সালে 'সমকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাতির শুঁড়,' ১৯৬৮ সালের দিকে লেখা 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা,' ১৯৬৯ সালে লেখা 'আসাদের শার্ট,' 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯,' 'হরতাল,' 'দুঃস্বপ্নে একদিন' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর গণমানুষ সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। তার কাব্যিক সৌন্দর্য ও সামাজিক-রাষ্ট্রিক-ঐতিহাসিক আবেদন বাঙালিকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। পাকিস্তান শাসনামলে শোষিত-বঞ্চিত-নিগৃহীত-অত্যাচারিত বাঙালি গণমানুষই, যাদের সঙ্গে চলেছেন শামসুর রাহমান দৈনন্দিন জীবনের মতোই- অন্তত কবিতায়। এজন্যেই তিনি 'বন্দি শিবির থেকে'-এর কবি, 'স্বাধীনতার কবি' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বঞ্চিত শোষিত অত্যাচারিত বাঙালির সহযাত্রী ছিলেন তিনি, যিনি তাঁর অবস্থান থেকে সোচ্চার সংগ্রামী ও সমব্যথী হয়েছেন, এমনকি মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। সে পরিকল্পনা সার্থক না হলেও বিশেষ কারণে, সার্থক হয়েছে পরোক্ষে তাঁর 'বন্দি শিবির থেকে'

কাব্যগ্রন্থসহ বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে; গ্রন্থটি তিনি লিখেছেন 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে, যে নামের মাধ্যমে তাঁর গণমানুষের প্রতি একাত্মতার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। কবি জীবনের প্রায় প্রথম দিকে রোমান্টিকতা যখন তার কণ্ঠলগ্ন, তখনও, আশ্চর্য হতে হয়, সে একাত্মতার ছবির আভাস লক্ষিত হয়। একটুখানি উল্লেখের এখানে প্রয়োজন বোধ হয়:

হরহামেশাই
দেখি পথে কর্মিষ্ঠ শ্রমিক তোলে মাটি
কোদালের ঘায়ে,
শ্রমের নিপুণ ছন্দে দোলে তার পেশল শরীর।[১০]

শ্রমের নিপুণ ছন্দে দোলা শরীর কখনো সংগ্রামেও দোলে, যার জন্যে সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন; তেমন নেতৃত্বের আবির্ভাব বাংলায় একাধিক ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবি শামসুর রাহমান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন তাঁর বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার আগেই, বাঙালির ভবিষ্যৎ নেতা নির্দেশক, গ্রিক পুরাণ চরিত্রের আড়ালে।[১১] এ ছাড়া পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তিনি বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা তিনি লিখেছেন। একস্থানে তাঁকে 'গণনায়ক' বলে অভিহিত করেন। সংশ্লিষ্ট স্থানের কথাটি হলো: "মনে হয়, ভবিষ্যতেও কবিগণ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা অর্পণ করবেন এই মহান গণনায়কের প্রতি তাঁর ট্রাজিক মহিমার দুর্মর আকর্ষণে।"[১২] উল্লেখ্য, অন্য এক স্থানে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা তাজউদ্দীন আহমদের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে।[১৩] বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলামিত্রের প্রতি শামসুর রাহমানের শ্রদ্ধা বর্ষিত হয়েছে তাঁর 'কালের ধুলোয় লেখা' শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে। গণমানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষা, জীবনাবস্থা, টানাপোড়েন ও সংগ্রামকে ক্রমশ তিনি কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন। বায়ান্ন, ঊনসত্তর, একাত্তর ইত্যাদি সালগুলোর সাথে কবিতায় তাঁর যে আন্তরিক ও দায়িত্বপালনপ্রবণ সখ্যের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়, তাতে সে পরিস্ফুটন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ফলে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের একটি দীর্ঘ সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিশেষ উৎস এখন।

গণমানুষ চেতনার প্রাথমিক পর্ব ও তাতে উদ্বাস্তু ও অসহায় মানুষের অবস্থান

শামসুর রাহমানের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের একেবারে প্রথম দিকের কবিতা 'কয়েকটি দিন : ওয়াগনে', যেখানে তাঁর গণমানুষ চেতনার প্রায় প্রথম সন্ধান লাভ করা যায়। 'পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দাক্ষিণ্যে পরিত্যক্ত ও অকেজো রেলওয়ে ওয়াগনে' বিহারের বাস্তুহারা একটি পরিবার যেভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছিলো তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন তিনি কবিতাটিতে। সে বর্ণনারই কিয়দংশ হলো:

বোনের কান্না! বৃদ্ধ পিতার ভীষণ কাশি!
ক্লান্ত রাত্রে ট্রেনের শব্দে ঘুম আসে না!
কয়লার গুঁড়ো আকাশে ছড়ায়। ক্ষীণ আকাশ।
অনেক স্বপ্ন ঢাকা পড়ে গেছে ধূলার চাপে।[১৪]

শান্ত অপরাহ্ণ, স্বর্গ-শিশির, চাঁদ-ফুল-পাখি ইত্যাদির ভিড়েও তাঁর চোখ আটকে যায় এক সময় ফুলের কাঁটা বা কীটের দিকে, চাঁদের কলঙ্কের দিকে; জোছনায় কবি কখনো দেখে ফেলেন অন্য রকমের দৃশ্য, যা মোটেই সুখকর নয়। সব মিলিয়ে অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের যে করুণ রূপ তিনি দেখেন তা তুলে ধরেন এমনভাবে:

খাঁ-খাঁ জ্যোৎস্নায় নগ্নিকা দেখি
শুকোতে দিচ্ছে ছেঁড়া শাড়ি তার।
বিশীর্ণ শিশু ঘন ঘন করে
মায়ের শূন্য হাতের তালুতে দৃষ্টিপাত।[১৫]

শামসুর রাহমান তাঁর দ্বিতীয় কাব্যেই কতোখানি মাটির কাছাকাছি চলে এসেছেন তা বোঝা যায় তাঁর 'খুপরির গান' কবিতাটি থেকে। ময়লা চাদর, ছারপোকা, ইঁদুরের উৎপাত আর বমিময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বদ্ধ ঘরে অনিদ্রা দুঃস্বপ্ন আর মাথাব্যথাসহ বস্তির জীবনযাপনের বাস্তবতা প্রায় আস্ত উঠে এসেছে এ কবিতায়। কবিতাটির কিছু অংশ:

বমির নোংরায় ভাসে মেঝে, রুটির বাদামি টুকরো
চড়ুই পালাল নিয়ে। তাকাব না কখনো বাইরে...
ঘরে জানলা নেই...হলুদ যেসাস বিদ্ধ কড়িকাঠে...
রৌদ্রঝলসিত কাক ওড়ে মত্ত রক্তে কাঠফাটা
আত্মার প্রান্তরে। সারারাত
অনিদ্রা দুঃস্বপ্ন আর
ছারপোকা, ছিদ্রান্বেষী ইঁদুরের উৎপাত উজিয়ে
ময়লা চাদর ছেড়ে উঠি ফের মাথাব্যথা নিয়ে।[১৬]

একই কাব্যের 'তিনটি বালক' কবিতায় ক্ষুধার্ত তিনটি বালকের ক্ষুধার স্বরূপ, খাদ্যান্বেষণ ও স্বপ্নের কথা বলেছেন কবি। নীচের স্বল্প উদ্ধৃতি সে বলাকে অনেকটা ধারণ করেছে:

রুটির দোকান ঘেঁষে তিনটি বালক সন্তর্পনে
দাঁড়ালো শীতের ভোরে, জড়োসড়ো। তিন জোড়া চোখ
বাদামি রুটির দীপ্তি নিল মেখে গোপন ঈর্ষায়।
রুটিকে মায়ের স্তন ভেবে তারা, তিনটি বালক...
মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখে: ম্লান কুয়াশায়
এক ঝাঁক ঘুঘু নামে পূর্বপুরুষের
সম্পন্ন ভিটায়।[১৭]

গণমানুষ চেতনায় কৃষিজীবী সম্প্রদায়

শামসুর রাহমান এক স্থানে কাব্যভাষায় বলেছেন, "আমার কবিতার ভাষায়/বেজে উঠবে দিনানুদৈনিক/জীবনযাপনের ছন্দ।"[১৮] এ জীবনযাপনের ছন্দ সাধারণ মানুষের অধিকাংশ; আর সে সাধারণ মানুষের একটি বড়ো অংশ কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে বড়ো আকারে সে ছন্দ কবিতার ভাষায় লক্ষিত হয় না। যতোটুকু লক্ষিত হয় তাই তুলে ধরে স্পষ্ট করে রাহমান-হৃদয়ের আন্তরিকতা কতোখানি গভীর ছিলো তাদের প্রতি। এবং সে কারণেই মনে করা যায় তাদের দুঃখ-দৈন্য-সমস্যার কথা স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ পরিসরের ছবি প্রতিফলিত করে তার। তাতে এ কথাগুলো সম্মর্তব্য হয়ে ওঠে যে, এ দেশে কোনো কালেই সে সমস্যাদি দূর হয়নি। এখনো তাদের অনেকের লড়াই থামেনি ভালো বীজ সার ইত্যাদির জন্যে। ধান মাড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে এখনো অনেকে তাদের জীবনটাকেই মাড়াই করে চলে। জোছনা আসে যায়, কিন্তু তাদের জীবনে কমবেশি অমাবস্যাই লেগে থাকে। পূর্ণিমা রাতের জন্যে প্রত্যাশা তাই তাদের কখনো থামে না। এ সত্য শামসুর রাহমানকে ব্যথিত করেছে, অকৃত্রিম হয়ে যা ফুটে উঠেছে তাঁর এ বয়ানে:

> ওর দিন কাটে মাঠের কাজে। লাঙল ঠেলে
> চিরে ফেলে মাটির বুক, বীজ বোনে,
> সে, রৌদ্রের আঁচে ভাজা ভাজা,
> নিড়ায় আগাছা আর দ্যাখে ওই আসছে আল বেয়ে
> গামছা-বাঁধা ডাল-ভাত টুকটুকে লঙ্কা নুন নিয়ে নথ-পরা বউ।
> ভাবে, কখন আসবে পূর্ণিমা রাত, যখন সে
> নাচবে ঢাকের তালে তালে আর হস্তধৃত হাতিয়ারের
> ফলা ক্ষণে ক্ষণে ঝলসাবে বন্য প্রাণীর চোখের মতো? [১৯]

আল বেয়ে আসতে থাকা নথ-পরা বউ-এর স্বপ্নের নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেও যে একসময় একজন কৃষকের স্বপ্নের কমবেশি প্রয়াণ ঘটে- পূর্ণিমা রাতের জন্যে তার কাতরতার বাস্তবতা তা ব্যক্ত করে।

গণমানুষ চেতনায় শ্রমজীবী সম্প্রদায় ও গ্রামীণ সাধারণ মানুষ

কৃষিজীবী মানুষের প্রাগুক্ত মাটি-নির্ভর জীবনালেখ্যের সঙ্গে অনেকটা তুলনীয় শ্রমজীবী মানুষ কুমোরদের জীবনালেখ্য। তবে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ভিন্ন; কিন্তু কষ্ট দারিদ্র্য আর নিঃস্বতার দিকে থেকে তাদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কুমোরদের শ্রম আর নিঃস্বতা কবির মনকে স্পর্শ করেছে। আর তাই এমন কবিতা তাঁর কলমের আঁচড়ে জন্ম নিয়েছে:

> কি শীত কি গ্রীষ্ম
> ঘোরে চাকা, চকচকে, গড়ে ওঠে ঢের
> ঘটিবাটি, হাঁড়িকুড়ি নানান ছাঁদের
> হাতের খানিক চাপে। একান্ত আপন তার হাত,
> নিশ্চিত জানে সে জগন্নাথ।
> রত্নের ঝলক বুকে সারাক্ষণ, অথচ কী নিঃস্ব![২০]

শ্রমিকের 'একান্ত আপন হাত'-এর মূল্য অনেক, কেননা শিল্প আর অর্থের উৎস সে হাত, এমনকি কখনো মিছিলেও সে হাত আকাশচুম্বী হয়, সোনালি ভবিষ্যতের আগমনকেও সম্ভব করে তোলে, যা কবির 'মে দিনের কবিতা'য় এমন করে ফুটে উঠেছে:

> এই হাত তার সকাল-সন্ধ্যা মেশিন চালায়,
> এই হাত তার মিছিলে মিছিলে আকাশচুম্বী,...
> ভবিষ্যতের জাবদা খাতায় যা টিপসই দেয়,
> দূরাগত কোনো রহস্যময় সুনীল পক্ষী
> এই হাতে তার চঞ্চু ঘষে।[২১]

এমন হাতের মূল্য অর্থাৎ তার দ্বারা উৎপাদিত শিল্প ও সম্ভাবনার মূল্য হয়তো নিশ্চিত জানেন জগন্নাথ, কিন্তু সে মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর তেমন সক্রিয়তা আছে বলে সংশ্লিষ্টদের মনে হয় না। ফলে বিশ্লিষ্ট হয় তাদের হৃদয়ের জমাট দুঃখ। চোখে জাগে করুণ বিস্ময় তাদের যখন দেখেন শিল্পজ্ঞানহীন বড়োলোকের রয়েছে অঢেল ধন-সম্পত্তি। কবির চোখেও অনেকটা তেমনই জাগে বিস্ময়। কারণ তিনি বড়োলোকের বিত্তময় ঝকঝকে শহরের পাশে তাঁর পিতার বিত্তহীন গ্রামের কথা ভাবেন। যদিও প্রাকৃতিক ও মানবিক আভার বিচ্ছুরণে ও সৌন্দর্যে সে নিভৃত লোকালয় অতুলনীয়, তবুও শহুরে নিয়ন আলোর আভার কাছে সেসব যেন খেই হারিয়ে ফেলে। মনে হয় তাঁর কাছে গ্রামটি যেন মনমরা নিষ্প্রভ- প্রবল হাওয়ায় 'কম্পমান নিবু-নিবু দীপ'। এমন মনে-হওয়া তাঁর 'আমার পিতার গ্রাম' নামের কবিতাটিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, যার কিছু অংশ এমন:

> উড়ে উড়ে চখা ঢোকে আমার ভেতরে সাবলীল;
> স্মৃতির দেয়ালি জ্বলে এবং আমাকে
> ঘিরে থাকে কবেকার হাহাকার। দূর থেকে দেখি
> আমার পিতার গ্রাম অতিশয় প্রবীণ আঁধারে
> অনন্তের উৎস থেকে উঠে-আসা প্রবল হাওয়ায়
> কম্পমান নিবু-নিবু দীপ।[২২]

শহরের অবক্ষয়িত রূপ, পেশাজীবী মানুষের জীবনের টানাপোড়েন ও শ্রেণি-বৈষম্য চিত্র

কবির ভেতরে উড়ে উড়ে চখা ঢোকে, কিন্তু বাস্তবতা হলো কবি হলেন জন্ম-শহুরে। শহরের মায়া-মোহ, ভালো-মন্দ এবং উন্নতি-অবক্ষয়ের রূপ তাঁর জানা আছে। কবিতায় অবক্ষয়বাদী চেতনার রূপায়ণ সম্পর্কে সমর সেনের ভাষ্য হলো: "অবক্ষয় বিষয়ে সচেতনা এক ধরনের শক্তি কিন্তু এমন একটা সময় আসছে যখন সেই শক্তিটুকু দিয়ে চলবে না। তখন মনস্থির করতে হবে। যে কবি তাঁর ব্যক্তিসত্তা অটুট রাখতে পেরেছেন গণ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলে তাঁর উপকার নিশ্চয় হবে।"[২৩] শামসুর রাহমানের তেমন উপকার হয়েছে বিশেষ করে কাব্যিক সৃজনশীলতায় বাংলাদেশের নানা আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। সমর সেনের কবিতায় যুগের অন্ধকার ক্লান্তি হতাশা অশান্তি লাম্পট্য সংস্কার-কুসংস্কার ও ক্লিন্ন পরিবেশের কথা যেমন এসেছে, শামসুর রাহমানের অনেক কবিতায়ও অনেকটা তেমন এসেছে, যেমন:

> এ শহর সাদা হাসপাতালের ওয়ার্ডে কেবলি
> এপাশ ওপাশ করে, এ শহর সিফিলিসে ভোগে,
> এ শহর পীরের দুয়ারে ধরনা দেয়, বুকে-হাতে
> ঝোলায় তাবিজ তাগা, রাত্রিদিন করে রক্তবমি,
> এ শহর কখনো হয় না ক্লান্ত শবানুগমনে।[২৪]

নাগরিকদের জীবন যাপিত হয় সাধারণত ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিতাড়িত সমাজের ক্লেদ ক্লেশ আর অবক্ষয়ের মধ্যে, যেখান থেকে নিস্কৃতি পান না মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যত্তি সমাজের পেশাজীবীরাও। তাঁরা অর্থের দিকে ক্রমাগত ধাবিত হয়ে হাঁপিয়ে ওঠেন কখনো, অথচ স্বল্প টাকার মায়াময় শেকল তাঁরা ছিঁড়তে পারেন না। তাই পেশাগত জীবন কখনো তাদের কারাগারের মতো মনে হয়, যেখান থেকে তারা কখনো ইচ্ছে হলেও মুক্তি লাভ করতে পারেন না। ফলে স্বতঃস্ফূর্ততাহীন এক জীবন নিয়ে তাদের থাকতে হয়। সে জীবনেরই অবিকল বর্ণনা দিয়েছেন কবি 'তিনশো টাকার আমি' নামের কবিতায়, যেটির কিছু অংশ এরূপ:

> আখেরে হলাম এই? আর দশজনের মতন
> দৈনিক আপিস করা, ইস্ত্রি করা কামিজের তলে
> তিনশো টাকার এই পোষমানা আমিকে কৌশলে
> বারোমাস ঝড়ে জলে বয়ে চলা যখন-তখন?
> এই আমি? এবং প্রভুর রক্তনেত্র সারাক্ষণ
> জেগে রয় ঘানিটানা জীবনের চৌহদ্দিতে; ফলে
> ঠাণ্ডা চোখে ঠুলি এঁটে দশটা-পাঁচটার জাঁতাকলে
> অস্তিত্বকে চেয়ে দেখি নিখুঁত গোলাম, নিশ্চেতন।[২৫]

তাই ঝকমকে শহর তেমন উজ্জ্বল কোনো বোধ বা উপলব্ধি সৃষ্টি করে না সাধারণ মানুষের মনে। জীবনবৃত্তে তাই অস্বস্তির ঘুরপাক তেমন থামে না। এমন অবস্থায় কবির মনে উপজে আত্মক্লেদ। অসমঞ্জস প্রতিবেশের সঙ্গে এভাবে কবি নিজেকে না মেলাতে পেরে আলাদা হয়ে যান। শামিল হতে পারেন না সহসা সাধারণ্যে, বরেণ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না প্রথাগত অনেক মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডকে। তাঁর তন্ময় রহস্যানুসন্ধানী মন বা বোধ-অনুভূতি-এষণাও এর পেছনে কাজ করেছে। এমন আপন মনোগত অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান অনেকটা গণমানুষের অবস্থা-অবস্থানকে ইঙ্গিত করে। সে অবস্থানে থেকে শহুরে 'বিকট স্বর্গের আবহে' থাকেন তিনি বিচ্ছিন্ন অনেকটা। তাই তিনি ভাস্করের অসম্পূর্ণ মূর্তির মতো ঘোরেন। এসব কবিতায় কবি যেভাবে বলেন:

> ভাস্করের অসম্পূর্ণ মূর্তির মতন ঘুরে ফিরি।
> উল্লোল নগরে কত বিলোল উৎসবে; কিন্তু তবু
> পারি না মেলাতে আপনাকে প্রমোদের মোহময়
> বিচিত্র বিকট স্বর্গে। বিষাক্ত ফুলের মতো কত।
> তন্ময় রহস্য জ্ব'লে ওঠে আজও দু'চোখে আমার।[২৬]

উল্লোল নগরই হলো সে পুঁজিতাড়িত চাকচিক্যময় শহর- যেখানে অন্নহীনদের হাহাকার আর মানবেতর জীবনের শূন্যতা প্রদীপের আলোর নীচে অন্ধকারের মতো থেকে যায়। বিলোল উৎসবের পাশেই সেখানে একটু কান পাতলেই শোনা যায় কষ্টের কলরোল। সে কলরোল শামসুর রাহমান কখনো না শুনে থাকেননি। সে শ্রবণ হেতু জাগ্রত গভীর আবেগ ও বোধ হতে তিনি উদ্ধার করেছেন শ্রেণিচেতনা, শেণিসংগ্রাম আর মুক্তজীবনের বাণী। তাই তাঁর কবিতায় আসন পায় নিম্নবেতনভুক কেরানি। তার জীবনের বিরস গান এভাবে গান তিনি:

> দিনরাত্রি পুঁথির শত পাহাড় খুঁড়ে দেখলে শেষে
> পোড়া কপাল! মূষিক মেলে।
> কালের মেঘে অকাল সাঁঝ নিমেষে এল হঠাৎ ভেসে:
> দেখলে শেষে যৌবনের পরম গতি নিরুদ্দেশে।[২৭]

তিনি কৃষক-শ্রমিক-মুটে-মজুরের কথা বলতে বলতে অফিসপাড়ার কেরানির কথাও যেমন বলতে ভোলেন না, তেমনই ভোলেন না তিনি সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ছত্রছায়ায় পাতিসাম্রাজ্যবাদীদের পাইকারি নরহত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ প্রজ্জ্বলন ইত্যাদির কথা বলতে। যে সাম্রাজ্যবাদী চক্র পূর্ববাংলাকে স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিলো, বাঙালির তেইশ-চব্বিশ বছরের সংগ্রাম সে চক্রকে বিতাড়িত করতে পেরেছিলো। ফলে জন্ম নিয়েছিলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু সে বাংলাদেশ গণমানুষের তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করতে পারেনি। বরং তার বুর্জোয়া রাজনীতির অভ্যন্তর থেকে জন্ম নিয়েছে লুটেরা সম্প্রদায়- যারা ধনতন্ত্রের বরপুত্র- মানবেতর জীবন যাপনকারীদের ত্রাণকর্তা নয়। ফলে শ্রেণিবৈষম্য বিশদ হতে বিশদতর হয়েছে এদেশে। এ বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করে কবি স্মৃতিকাতর হন, মনে করেন পরোক্ষে সে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট, তার বিরুদ্ধ শক্তির পাশবিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদিকে:

> ...যা দেখেছি এতদিন-
> পাইকারি হত্যা দিগ্বিদিক রমণীদলন আর ক্ষান্তিহীন
> রক্তাক্ত দস্যুতা তোমাদের, বিধ্বস্ত শহর, অগণিত

দগ্ধ গ্রাম, অসহায় মানুষ, তাড়িত, ক্লান্ত ভীত—
এই কি যথেষ্ট নয়? পারবে কি এসব ভীষণ
দৃশ্যাবলি আমূল উপড়ে নিতে আমার দু-চোখের মতন?[২৮]

স্বাধীনতা পরবর্তী অবাঞ্ছিত পরিবেশ, নব্য লুটেরা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও তাদের শিকার সাধারণ মানুষের পরিণতি

স্বাধীনতা পরবর্তী নব্য লুটেরা সম্প্রদায়ের বা স্বদেশি বর্গিদের উৎপত্তি বুর্জোয়াব্যবস্থার এক পরিণতি। সে পরিণতির কারণেই শ্রমজীবী মানুষের ক্লেদাক্ত জীবনের কাহিনি শেষ হয়নি। তবে সে কাহিনি শেষ করার উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ বা তৎপরতা যে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো এক-এক করে- তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সে প্রেক্ষাপটেই বঙ্গবন্ধু আকস্মিকভাবে নিহত হন। লুটেরাদের লুণ্ঠন তাই থামেনি বা কমেনি; সে লুণ্ঠন এবং সংশ্লিষ্ট অরাজকতার চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন এভাবে:

দুঃস্বপ্নে বাঁচাই সার, অগণিত অজ্ঞাত করুণ
কংকালে শিউলি ঝরে। দেশব্যাপী লুটেরা জোচ্চোর
স্ফূর্তিতে বিহ্বল; কেউ কেউ ওরা ভাটিয়ালি গায়,
অনেকে ট্যাঙোর তালে কোমর দোলায়, কখনোবা
চাঁটি মারে পরস্পর, স্বদেশী বর্গীরা দেয় হানা
পাড়ায় পাড়ায়, কখন যে কার থলে থেকে, হায়,
বেড়াল বেড়িয়ে পড়ে আচমকা।[২৯]

তার পরে আসে সামরিক শাসন, যখন আদর্শ হয় বিনষ্ট ফলের মতো, সৎ-অসতের ভেদাভেদ হয় লুপ্ত, বা ভালো-মন্দের মূল্যায়নহীনতার অবস্থা হয় জাগ্রত। উত্থান ঘটে নব্য ক্রোড়পতিদের। নিঃস্বরা আরো নিঃস্ব হতে থাকে। উদ্ভট উটের পিঠে চলতে থাকে স্বদেশ। সে স্বদেশের অবস্থা চাঁদ সদাগর বর্ণিত চম্পক নগরের অবস্থার সদৃশ। কবি-বর্ণিত সে অবস্থা হলো:

নারীর শ্লীলতাহানি করে না অবাক কারুকেই।
সৎ অসতের ভেদাভেদ লুপ্ত, মিথ্যার কিরীট
বড় বেশি ঝলসিত দিকে দিকে, লাঞ্ছিত, উদ্‌ভ্রান্ত
সত্য গেছে বনবাসে। বিদ্বানেরা ক্লিন্ন ভিক্ষাজীবী,
অতিশয় কৃপালোভী প্রতাপশালীর। নব্য কত
ক্রোড়পতি করে ক্রয় সাফল্যের অন্দর বাগান,
দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হবার ফাঁদে পড়ে
কাঁদে, করে করাঘাত দিনরাত সন্ত্রস্ত কপালে,[৩০]

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা- এসব ক্ষেত্রে বঞ্চনা থেকেই সমাজে শ্রেণি-বিভক্তির রেখা গাঢ়তর হতে থাকে, শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রাম উদ্ভূত হয়। এ শ্রেণিসংগ্রাম ও পুঁজিবাদী শোষণ-নিগ্রহ, বঞ্চিত মানুষের খাদ্যসমস্যা, ক্ষুধা ইত্যাদি শামসুর রাহমানের কবিতায় বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। সন্তানের পাতের ভাত সাত কাকের খাওয়ার মধ্য দিয়ে কিছু কাকরূপী মানুষের কারণে অর্থনৈতিক বঞ্চনাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের চিত্র ফুটে ওঠে, যা প্রকাশিত হয়েছে নিচের কবিতাংশে, যার মধ্যে আবার 'ব্যর্থ অন্নপূর্ণা' শব্দগুচ্ছ রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে:

দেখতে পাচ্ছো না, সাত ঘাট থেকে চেয়ে-চিন্তে-আনা
হে ব্যর্থ অন্নপূর্ণা,
যে, তোমার সন্তানের পাতের ভাত খায় সাত কাকে।[৩১]

অত্যন্ত অস্বচ্ছল মানুষের দুঃখ-কষ্ট-দৈন্যে ভরা দিনযাপনের চিত্র নিচের উদ্ধৃতিতে, যেখানে গণমানুষের বিশ্রামহীন শ্রমদানের তথ্যটি সুপ্ত:

খরদুপুরে কোথায় আমি অন্ন পাবো? কোথায় পাবো
চৈত্রপোড়া আঁজলাভরা পানি?
সময় যে নেই, বিহান ত্বরায় গড়ায় নিশুত রাতের অমায়,
হাটবাজারে টানি নাছোড় ঘানি।[৩২]

এবং প্রায় একই তথ্য নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিনিচয়েও সঞ্চিত, যেখানে 'ক্ষুধার করাতে চেরা' মানুষের কথা বিধৃত, যাদের অস্বচ্ছল জীবনেও হানা দেয় শোষণকারী বা লুণ্ঠনকারীরা, যারা 'চ্যাঙড়ামুড়ি কানি'র প্রতীকে প্রকাশিত:

একমুঠো তণ্ডুলের জন্যে কাঠুরের সঙ্গে কাঠ
কেটেছি গহন বনে ঝরিয়ে মাথার ঘাম পায়ে,
পথকে করেছি ঘর। কতবার চ্যাঙড়ামুড়ি কানি
নানা ছলে কেড়ে নিয়ে আমার ঘর্মাক্ত দিনান্তের
কষ্টার্জিত অন্ন খলখল ব্যাপক উঠেছে হেসে,
ভেবেছে অভুক্ত আমি ক্ষুধার করাতে চেরা,[৩৩]

কবি তাঁর কবিতার খাতাকে সঙ্গে নিয়ে যেসব বিষয় থেকে কিছু লিখে ও শিখে নেন সেসব উল্লেখ করেছেন। উল্লেখে দেখা যায়, অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে, রয়েছে আবার অনেক কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে কিছু লিখে নেন, শিখে নেন তিনি ভাষা আন্দোলন, ভাসানীর পদযাত্রা, রাজবন্দির নির্যাতিত জ্বলজ্বলে চোখ আর শেখ মুজিবের স্বাধীনতা-ঝলসিত উদ্যত তর্জনী থেকে। আরো শিখে নেন তিনি যেভাবে- জানা যায় নিচের উল্লেখটি থেকে:

স্বপ্নপ্রসূ কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো থেকে,
পরাবাস্তবের সূর্যমুখী থেকে কিছু শিখে নেয়
আমৃত্যু আমার সঙ্গী কবিতার খাতা।
রৌদ্রদগ্ধ শস্যক্ষেতে কৃষকের অবস্থান থেকে,
বিবাহ বাসর আর কবরের বাতি থেকে কিছু শিখে নেয়
আমৃত্যু আমার সঙ্গী কবিতার খাতা।[৩৪]

সমাজতন্ত্র থেকে শুরু করে কবর অবধি কবির কবিতার খাতার শিখে নেয়ার এই প্রচেষ্টা- যা কবির প্রচেষ্টারই নামান্তর- প্রতীয়মান করে সাধারণ মানুষের জীবন উপলব্ধির তাঁর প্রয়াসের এবং তাদের অবস্থানগত ভারসাম্য আনয়নের তাঁর আকাঙ্ক্ষার সত্য বা তথ্যকে। কবি আর একটি কবিতায় বলেছেন, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, শোষণ, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ইত্যাদির অপনোদন না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক অব্যবস্থা সামাজিক সুব্যবস্থায় ও 'ভাঙা হাটে গণতন্ত্র' সুগঠিত গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে না। তেমন কোনো রূপান্তর হয়নি বলে ফলস্বরূপ সৃষ্ট হয় যে অসম আর্থ-সামাজিক দুর্দশায় পিষ্ট মানুষের ক্ষোভ আফসোস ও হতাশাপূর্ণ বিশ্বাস ও অভিব্যক্তি, তাই ধ্বনিত হয় এভাবে:

দেবে না তোমরা দেবে না
ক্ষুধা মেটানোর জন্য
দুবেলা দু'মুঠো অন্ন...
মাথা গুঁজবার ছাপড়া
নগ্নতা-ঢাকা কাপড়া
দেবে না তোমরা দেবে না।[৩৫]

অধিকার বঞ্চিত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম এবং সে সংগ্রামের পক্ষে যাঁরা চালিকাশক্তি বা অনুপ্রেরণা হিসেবে থেকেছেন তাঁদের আদর্শ- এসব শামসুর রাহমানের কাব্যবিষয় হয়েছে বারবার। একই সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁদের কারো দুরবস্থা, অবমূল্যায়নের চিত্রও সেখানে সংশ্লিষ্ট থেকেছে। নীচের কবিতাংশে প্রমাণ মেলবে তার:

তিনি, আবদুস শহীদ, খাপরা ওয়ার্ডের বিপ্লবী,
আজ এ কেমন ছবি
তাঁর! শোণিতে শর্করার কোলাহল, দ্রুত তন্তুক্ষয়,
একদা স্বপ্নের বীজময়
উর্বর চোখের নিচে দুঃসময়ের কালি নিয়ে রাস্তার ধারে
ভাদ্রের দুপুরে বন্দি, পরিত্যক্ত।[৩৬]...

শামসুর রাহমান মনে করেন, তাঁর কবিতা শুচি হয় সহজ-সরল খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলে, শুচি হয় সাধারণ মানুষসহ তাবৎ ভালোমানুষের কথা বলে, আর মন্দ মানুষের প্রতি গালমন্দসূচক কথা বলে। কোনো লোভে পড়ে অশুভ কর্মকাণ্ডের হোতাদের কাছে নত হয়ে তাঁর কবিতা অশুচি হতে চায় না কখনো। এ না চাওয়ার কথাগুলো কবি ঘোষণার মতো করে বলেছেন এভাবে:

আমার কবিতা, আমি ঘোষণা করছি,
কখনো স্বৈরাচারী শাসক, নষ্ট মন্ত্রী, ভ্রষ্ট রাজনীতিবিদ,
কালোবাজারি আর চোরাচালানিদের
সঙ্গে ফুলের তোড়া সাজানো এক টেবিলে ডিনার খেতে
প্রবল অনাগ্রহী, বরং গরিব গেরস্তের ঘরে
ভাগ করে খাবে চিড়ে গুড়। জেনে রাখুন
আমার কবিতা পুলিশের লাঠি আর
বন্দুকের উদ্যত নল দেখে দেবে না চম্পট।'[৩৭]

সাধারণ শুভ মানুষের কাছে থাকার এবং সাম্য ও সততার সকাশে থাকার কবির এ দৃঢ় প্রত্যয় বা শপথ তাঁর গণমানুষ সচেতনতা ও প্রীতি সংশ্লিষ্টতা, এবং তার প্রগাঢ়তাকে চিহ্নিত ও নিশ্চিত করে। এবং নিশ্চিত করে তাঁর দৃঢ় শুভবাদী সত্তার সত্যতাকে, যা উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে ভ্রষ্ট নষ্ট সবকিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে।

গণমানুষ চেতনায় সাধারণ মানুষের পরিত্রাণ চিন্তা

প্রাগুক্ত পরিচ্ছেদে উল্লিখিত-জাতীয় মানুষ ও পরিবেশের হাত থেকে সাধারণ মানুষ তথা দেশকে উদ্ধার করার জন্যে, কবি মনে করেন আর একটি অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রয়োজন, অর্থাৎ স্বাধীনতার শক্তির উদ্বোধনের প্রয়োজন। তাই কবি স্বাধীনতাকে গর্জে ওঠার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। স্বাধীনতার সুফলকে গণমানুষের কাছে প্রকৃত অর্থে পৌঁছে দেয়ার জন্যে কবির এ আহ্বান যেভাবে ধ্বনিত হয়েছে, তাঁর 'গর্জে ওঠো স্বাধীনতা' কবিতা থেকে তা তুলে ধরা হলো:

নেলসন মান্দেলার দীর্ঘ কারাবাসের দোহাই,
বীর যুবা নূর হোসেনের শাহাদাতের দোহাই,
দিগন্ত কাঁপিয়ে ক্রুদ্ধ টাইটানের মতোই আজ
হাতের শেকল ছিঁড়ে ফেলে
গর্জে ওঠো, গর্জে ওঠো তুমি স্বাধীনতা।[৩৮]

সামরিক শাসন, স্বৈরাচার, রুগ্ন অথবা বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র ইত্যাদির কারণে গণমানুষের যে দুরবস্থা হয় তা থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্যে কবি সরাসরি তাদের প্রতিবাদ মিছিল বা আন্দোলন-সংগ্রামে যোগদান করতে চান; এমন চাওয়া 'তোমাদের মুখ' নামের কবিতায় যেমন করে চিত্রিত হয়েছে:

তবু আমি ছুটে যেতে চাই রাজপথে,
যে আমার পদধ্বনি চেনে, সামিল
হতে চাই মিছিলে, জনতার মঞ্চে, যেখানে
মানুষ দৃপ্ত প্রত্যয়ে নজরুলের আগুন-ঝরানো
কবিতার মতো অঙ্গীকারাবদ্ধ আর সঙ্গীতময়।[৩৯]

আর একটি কবিতায় চিত্রিত হয়েছে তাঁর প্রিয়তম শহরকে যারা একাত্তরের ধরনে বন্দিশিবির বানিয়ে প্রেতনৃত্যে মতে উঠতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তাঁর লানত বা অভিশাপ উগরে দেয়ার কথা।[৪০] তেমন অভিশাপ বা উচ্চারণ যাদেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তাদেরই পাশে থাকার ইচ্ছে পোষণ করেছেন, সর্বদা সজাগ থাকার সাধনা করেছেন। এ জন্যেই "না রাজু, তোমাকে আমরা ঘুমোতে দেব না" বলতে পেরেছেন, যে রাজুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মধ্যযুগের প্রেতনৃত্য স্তব্ধ করার শুভ শ্লোক।[৪১] উল্লেখ্য, রাজুরা প্রদীপ্ত সাধারণ মানুষ, গণমানুষ, বা গণমানুষের প্রতিনিধি স্থানীয়।

যিনি গণমানুষের কথা বলেন, তাঁর মুখেই ভালো মানায় অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও দেশ গড়ার কথা। শামসুর রাহমান সে রকম কথা বলেছেন, বলেছেন- মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়- সে মানুষ, আর কোনো পরিচয় তার বড়ো হতে পারে না। এমন বক্তব্যের সুন্দর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁর 'পান্থজন' কবিতায়। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি কবিতাটির:

বহু পথ হেঁটে ওরা পাঁচজন গোধূলিতে
এসে বসে প্রবীণ বৃক্ষের নিচে ক্লান্তি মুছে নিতে।...
পঞ্চম পথিক খুব কৌতূহলবশে
কুড়িয়ে পতঙ্গ এক বলে স্মিত স্বরে, 'আমি মানব সন্তান।'[৪২]

'সফেদ পাঞ্জাবি' কবিতায় তিনি অসংখ্য সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন যারা সবাই পল্টনের মাঠে বন্যা দুর্গত এলাকা ফেরৎ মওলানা ভাসানীর কথা শোনার জন্যে সমবেত। সে কথা শুনে তাঁর মনে হয়েছে, তিনি ঢেকে দিতে চান সে দুর্গত এলাকার বেআব্রু লাশগুলো তাঁর সফেদ পাঞ্জাবি দিয়ে, কবির ভাষায় যা এমন: "যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব/বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।"[৪৩] উল্লেখ্য এখানে, লাশগুলোর অধিকাংশ যে গণমানুষের তা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না কাব্যগত বর্ণনা, ঐতিহাসিক সত্য বা তথ্যের কারণে।

কাব্য নির্মাণকলায় গণমানুষ ভাবনা

কাব্যের আলঙ্কারিক প্রয়োজনে উপমা ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান কখনো সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের প্রসঙ্গ এনেছেন। যেমন এখানে বুড়ো রাজমিস্ত্রির ছানিপড়া চোখের সাথে আকাশের তুলনা করেছেন:

রাতে খড়খড়িটা খুলে দেখি
বুড়ো রাজমিস্ত্রির চোখের মতো ছানি-পড়া আকাশে
জ্যামিতিক চাঁদ শোনে তারার কথকতা, সেই মুহূর্তে
রহমত ব্যাপারীর রক্ষিতা হয়তো তার ক্লান্ত যৌবনটাকে
কুঁচকে যাওয়া পোশাকের মতো
এলিয়ে দিয়েছে রাত্রির আলনায়।[৪৪]

রাজমিস্ত্রির চোখ দেখার চোখ তাঁর আছে বলেই দৃষ্টি পড়ে তাঁর কখনো পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জের দিকে।[৪৫] দৃষ্টি পড়ে এই সত্যের দিকে যে, বস্তির ছেলেটারও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সংযুক্তি বা অবদান রয়েছে, যা এভাবে কাব্যভাষা পেয়েছে 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায়, যেখানে একটি বস্তির ছেলের হাতের মুঠোয় 'স্বাধীনতা' শব্দটির জ্বলে ওঠার মধ্যে একটি আলঙ্কারিক ব্যাখ্যার অবকাশ সৃষ্টি হয়:

বস্তির দুরন্ত ছেলেটার
হাতের মুঠোয়
সর্বদাই দেখি জ্বলে স্বাধীনতা নামক শব্দটি।[৪৬]

স্বাধীনতার সাথে অভেদাত্মা কল্পিত হয় এ পঙ্‌ক্তি নিচয়ে, যেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধে মজুর যুবা শ্রেণির বা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের অবদান ঝলকিত: স্বাধীনতা তুমি/মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।[৪৭] অন্য একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা দুটি শব্দের একটি সমাসবদ্ধ পদ পাওয়া যায়; সমাসবদ্ধ বলে সেটিকে একটি শব্দ হিসেবে দেখানো যায়; শব্দ দুটিকে সহজেই সংযুক্ত করা যায়, বা মাঝে 'হাইফেন' দিয়ে যুক্ত অবস্থায় রাখা যায়। তবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রথম শব্দটি যদি বিশেষ্য হয় এবং দ্বিতীয় আর একটি বিশেষ্য শব্দকে বিশেষিত করে তবে প্রথম শব্দটিকে ইংরেজিতে 'attributive noun' বলা হয় । শব্দটি হলো 'শব্দ শ্রমিক'- যার দ্বারা কবি নিজেকে বুঝিয়েছেন; প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার হলো এখানে 'শ্রমিক' শব্দটির ব্যবহার, যার মাধ্যমে কবির গণমানুষের সাথে শামিল হওয়ার চেষ্টা স্ফুট, যা নিচের পঙ্‌ক্তিকয়টি ধারণ করে আছে:

ছলছুতো ক'রে
বহুরূপী মন্ত্রণার ছমছমে কর্কশ প্রহরে
একজন শব্দ শ্রমিকের মুখ ঘোর অন্ধকার
ক'রে দেয়া কী এমন শক্ত কাজ আর
একালে?[৪৮]

'বন্দি শিবির থেকে' ও গণমানুষ

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কালীন অবরুদ্ধ, দখলদার বাহিনী কবলিত ঢাকা শহরে সে বাহিনী সাধিত অত্যাচার গুম হত্যা লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি শামসুর রাহমানের 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থে বিধৃত, যা গণমানুষের প্রতিনিধি-কবির মতো তিনি কাব্যিক ভাষায় ধারণ করেছেন। সে গণমানুষ বাঙালি জনগণ তখন। এক ভয়াবহ বন্দি শিবিরে তখন তারা আবদ্ধ, ভীত নিপীড়িত, দুঃস্থ। সে জনগণ তখন 'স্বাধীনতা,' 'বাংলাদেশ' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে মরিয়া, কিন্তু উচ্চারণ করলেই তাদের অত্যাচারিত হতে হয়, মরতে হয়। তাদের বারবার 'রক্তগঙ্গায়' ভাসার কারণে তিনি প্রশ্নাকুল, বিক্ষুব্ধ। বাঙালির নবজাগরণ, ঐক্য, সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের দীর্ঘ যে একটি ইতিহাস রয়েছে তা বারবার ওই রক্তগঙ্গায় ভাসার কথাটি প্রকাশিত করে। সে ইতিহাসের কিছু সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কবিতায়, যেখানে সকিনা বিবি, হরিদাসী, মোল্লাবাড়ির বিধবা, হাড্ডিসার অনাথ তরুণী, সগীর আলী, কেষ্ট দাস, মতলব মিয়া, রুস্তম শেখ প্রমুখের নাম উল্লিখিত হয়েছে। কবিতাটির কিছু অংশ:

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।[৪৯]

'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতাকে তুলনা করার জন্যে কৃষকের হাসি, মজুর যুবার গ্রন্থিল পেশী, মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক ইত্যাদি উপমান আহরণ করেছেন। 'না, আমি যাবো না' কবিতায় 'বাস্তুত্যাগী সন্ত্রাস তাড়িত হাজার হাজার লোকে'র কথা বলেছেন। 'মধুস্মৃতি' কবিতার মধুদার কথা, 'গেরিলা' কবিতার গেরিলাদের অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, 'গ্রামীণ' কবিতার মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠা গ্রামীণ মানুষের কথা শামসুর রাহমানের কবিসত্তার গণমানুষ চেতনার বিশেষ বার্তাটি দেয়। সে বার্তাটি যেভাবে বিস্তারিত হয়েছে তার খণ্ডাংশ হলো:

হে রাখাল, হে দোতারা তোমাদের কাছ থেকে দূরে
কখনো পারিনি যেতে,...আমিও হঠাৎ
কেন গণ্ডগ্রামে অস্ত্রাগারে ক্ষিপ্র বাড়ালাম হাত?[৫০]

বাঁশি বা দোতরা ইত্যাদির সাথে যাদের সখ্য, যারা রাজনীতি বোঝেন না, চিন বা আমেরিকা চেনেন না, সে সব সাধারণ গ্রামীণ মানুষও কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে 'গ্রামীণ' শীর্ষক কবিতাটিতে। সে ইতিহাসের সাথে আর একটি বিষয়ও এখন ইতিহাস হয়ে রয়েছে, সেটি হলো মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠা সে গ্রামীণ মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার্পণ।

বঙ্গবন্ধু বিষয়ক পঙ্‌ক্তিমালা ও গণমানুষ চেতনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে একটি গণমানুষমুখী নেতৃত্বদানের বিশেষ ক্ষমতা ছিলো, তাই তিনি এ অঞ্চলের বাঙালি জনগণের প্রিয় নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, বা সাধারণ মানুষের প্রতিভূ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর ক্ষুব্ধ ও সংগ্রামী সত্তাকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন তিনি বাঙালি জনমনে; আবার বাঙালির সংগ্রামী ঐতিহ্য ও প্রেরণা ক্রমশ স্বতঃস্ফূর্ত ও বলীয়ান হয়ে উঠেছিলো তাঁর প্রাণে। উভয়ের ঐক্য ও মহা উত্থানের ফলে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, স্বাধীনতার সূর্যোদয় হয়েছিলো, আবির্ভাব হয়েছিলো 'বাংলাদেশ' নামের এক স্বাধীন ভূখণ্ডের। এ সূত্রে বঙ্গবন্ধুর যে মহিমা নিরূপিত হয় তা শামসুর রাহমান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, যা তাঁর অনেক কবিতায় বিধৃত হয়। ফলে তাঁর গণমানুষ চেতনা বিশেষ এক মাত্রা পায়। যে কবি বলতে পারেন এমনভাবে- "যারা গণহত্যা/করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,/আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকেড়ের চেয়েও অধিক/পশু সেইসব পশুদের" কিংবা লিখে ফেলতে পারেন যিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একক একটি কাব্যগ্রন্থ 'বন্দি শিবির থেকে'- তাঁর কবিতায় সে মাত্রার অধিষ্ঠান যে যথার্থই হয়েছে, তা ভাবা যায়।[৫১] সে ভাবনার সাথে হুবহু মিলে যাবে সংশ্লিষ্ট কিছু কাব্যভাষ্য বা কবিতা। সেগুলোর মধ্যে একটি 'টেলেমেকাস'- যেটি শেখ মুজিবুর রহমানের 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাওয়ার আগেই ১৯৬৬ বা ১৯৬৭-এর দিকে লেখা হয়। 'ধন্য সেই পুরুষ,' 'তোমার নাম এক বিপ্লব,' 'তাঁর আগমন এবং প্রস্থান,' 'আজীবন অক্লান্ত সাধনা ছিল তাঁর,' 'যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতি-বলয়,' 'ইলেকট্রার গান,' 'এত অন্ধকারময়' ইত্যাদি কবিতায় বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ এসেছে, যেসবের মধ্য দিয়ে তাঁর গণমানুষ সংশ্লিষ্টতার কথা নানাভাবে ফুটে উঠেছে। সে পরিস্ফুটন অধিক সংখ্যক উদাহরণের মাধ্যমে দেখানোর অবকাশ এখানে নেই। কেবল একটি কবিতা- 'ধন্য সেই পুরুষ' থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি, যে পঙ্‌ক্তি কয়টিতে যিনি 'জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত' সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিম্বিত হয়ে উঠেছেন:

ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের উপর পাখা মেলে দেয়
জ্যোৎস্নার সারস,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের উপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।[৫২]

গণমানুষ চেতনার বৈশ্বিক ব্যাপ্তি

সাধারণ মানুষের গলার স্বর, যে কোনো দেশেরই হোক না কেন, প্রায় একই। সে অর্থে শামসুর রাহমানের গণমানুষ চেতনা কিছু না কিছু ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাত্রায় বৈশ্বিক স্বদেশ পরিসরেও। তবে তাঁর গণমানুষ চেতনা কোথাও স্বদেশের বাইরে বিস্তৃত হয়েছে সরাসরি। যখন তিনি বলেন, "আমার কবিতা বলিভিয়ার জঙ্গলে/ চেগুয়েভারার বয়ে যাওয়া/রক্তের চিহ্ন"- তখন তাঁর সে চেতনা আন্তর্জাতিকতা পায়। তা আরো বিস্তৃত হয় তিনি যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিরোশিমা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনেন 'আক্রান্ত হ'য়ে' নামের কবিতায়; যদিও সেখানেও বাংলার ভাগ হওয়া, অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষের দিশেহারা জীবন ইত্যাদির কথা রয়েছে।[৫৩] আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামে রত কালো মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা স্থান পেয়েছে 'কালো মেয়ের জন্যে পঙ্‌ক্তিমালা' কবিতায়। কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি:

> স্বাধীনতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে
> সাক্সফোনে সে তুলবে তোমার পূর্ব পুরুষদের যন্ত্রণার সুর,
> জীবনকে মৃত্যুর দেশ থেকে ছিনিয়ে আনার সুর;
> তোমার ক্রুশবিদ্ধ মর্যাদার ক্ষতগুলো ধুয়ে
> সেখানে ফোটাবে সে প্রসন্ন অর্কিড,
> সে তার জোরালো কালো হাতে মুছিয়ে দেবে আফ্রিকার
> কালো হীরের মতো চোখ থেকে গড়িয়ে-পড়া অশ্রুজল।[৫৪]

সামরিক শাসন, স্বৈরাচার, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ইত্যাদির কারণে বিশ্বে সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন পেশাজীবী-শ্রমজীবী মানুষের যে ক্ষতি হয় তার কথা তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ফুটে উঠেছে। 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থে 'প্রাত্যহিক' কবিতায় "দুনিয়ার সব শৃঙ্খলিত কৃষক মজুর শোনো,/সর্বহারা নিধনের জন্যে অবিরাম/আসছে বারুদ বোমা স্বৈরাচারী শাসকের হাতে"- বলে সমকালীন এক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সত্যকে, সামরিক কূট কৌশল ও আগ্রাসন তথ্যকে প্রকাশিত করেছেন, যে আগ্রাসনের শিকার হয়েছে প্রধানত গণমানুষ। 'দুনিয়ার' শব্দটি দ্বারা সে মানুষ সারা বিশ্বের যে তা স্পষ্ট হয়।[৫৫] অনেক কবিতায় অসাম্প্রদায়িক মানবধর্ম নিয়ন্ত্রিত সমাজের কথা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বর্ণবাদ বিরোধী কথাও তাঁর কবিতায় দুষ্প্রাপ্য নয়; কিছু প্রাপ্যতা দিয়ে অংশত হলেও উদাহরণসহ ইতঃপূর্বে তার প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে তাঁর কবিতায় গণচেতনা বা গণমানুষের জীবনেতিহাস ঋদ্ধ নানা ভাবনা অনুভব ও অভিজ্ঞতা প্রণিধানযোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

উপসংহার

শামসুর রাহমানের কবিতায় জাতীয় আন্দোলন সংগ্রাম অর্জন ও গৌরব নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে; তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে বিশেষ সংশ্লেষ ছিলো তাও প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের সাধ-আহ্লাদ, কষ্ট-টানাপোড়েন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, ক্ষোভ-প্রতিবাদ-সংগ্রাম ইত্যাদির সাথে চিত্রিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট সমাজ রাজনীতি ইত্যাদির অন্তর্গত নেতিবাচকতা ও তার দ্বারা সৃষ্ট বিরুদ্ধতা ও বিরূপ পরিবেশের ছবি। এসবের ভিত্তিতেই শামসুর রাহমানের গণমানুষ চেতনা বিচারকালে বিবেচনাযোগ্য হয়ে উঠেছে তাঁর সমাজ-রাজনীতি সচেতনতা, যদিও তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না, বা কোনো দলের অন্ধ সমর্থক ছিলেন না।[৫৬] সেখানে এ বিষয়টি উপলব্ধ হয়েছে, সুকুমার হৃদয়বৃত্তি, সুললিত সমাজমনস্কতা, ন্যায় ও মানবতাবোধ, মঙ্গলচিন্তা বা শুভবোধ তাঁর কবিসত্তার গণমানুষ চেতনাসমৃদ্ধ হয়ে ওঠার পেছেনে ভূমিকা পালন করেছে। সে চেতনার আলোকে তিনি প্রথাগত সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, সমাজের অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কার, ক্লেদকে ক্ষোভের সাথে চিত্রিত করে সেসবের অপনোদন চেয়েছেন। প্রথাগত রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁর চাওয়ার স্বরূপটি প্রায় একই। তিনি অবক্ষয়িত সমাজ-রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে কখনো ব্যঙ্গ করেছেন, কখনো নিজেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘৃণার তীর ছুঁড়েছেন। আবার মঙ্গলের মৃদঙ্গ বাজিয়েছেন; সব মিলিয়ে উদ্দেশ্য হলো তাঁর মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজানো। সে নৈবেদ্য পেয়েছে একজন রাজু, নূর হোসন প্রমুখ; একজন শ্যামল বা সূর্যকিশোর। বন্ধু সূর্যকিশোরের কথা তিনি ভুলতে পারেননি। এ বন্ধুত্ব, মানবিক মূল্যবোধ সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার নিয়ামক। তাঁর কবিতায় ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের কথা, নষ্ট সমাজব্যবস্থা, নষ্ট রাজনীতি ও নষ্ট মানুষের কথা বার বার উঠে এসেছে; তবে আশাবাদের কথা বলতে তিনি ভোলেননি। তিনি যে আধুনিক যুগেও রোমান্টিক এবং জীবনবাদী কবি ছিলেন অভ্যন্তরে, এখানে তার অনেকটা প্রমাণ। এ কারণেই অনেকটা সমাজ-রাজনীতির ত্রুটিগুলো তাঁর চোখে পড়তো, যেসব ত্রুটি সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও সাধের পথে অন্তরায়। সাধারণ মানুষ তথা গণমানুষের সাথে সখ্য সৃষ্টি হয় তাঁর এ সূত্রেই। তিনি এক স্থানে বলেছেন কাব্যভাষায়, "যতদিন আছি,/ভিখারির মতো নয়, শ্রমিকের মতো তেজী, আন্দোলনলিপ্সু,/পদক্ষেপে জীবনের কাঁধে/পর্যটন করে যাবো তেজস্ক্রিয় আবর্জনাময়/আমাদের এই পৃথিবীতে।"[৫৭] যদিও এ সখ্য, এ কাজ বা প্রতিজ্ঞা ঝুঁকিপূর্ণ, তা কেড়ে নেয়ার জন্যে প্রতিবেশে কম কিছু প্রস্তুত নেই; যা তাঁর স্বপ্নের হাঁসের সাথে খেলা করার সুযোগে বা অপ্রস্তুত অবস্থায় সাধিত হয়।[৫৮] কবি বুঝতে পারেন তা, বুঝতে পারেন যে তাঁর নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতার সুযোগ নিয়ে কারা যেন বাক্স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে; অমনি তাঁর বিদ্রোহী কবিসত্তা "গাছের পাতা, আকাশের নক্ষত্র, নদীর ঢেউ, প্রতিটি ফুল, চোখের মণি, হাত, গাছ সবাইকে বাক্স্বাধীনতা দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।" তাই গণসংগ্রামে শামিল হবার ডাক এলে 'প্রিয়া'র সলজ্জ সান্নিধ্যে যাবার তাঁর মন থাকে না।[৫৯] "And slowly, but surely, he discovered his own voice, cares for people, cares for everyday, and who feels pain and pleasure with the people, who suffers with them, for them, and-surprise!"[৬০] এ আবিষ্কারের পেছনে আরো যে কারণ, তা হলো, তিনি ছিলেন সত্য সুন্দর মঙ্গল ও কল্যাণের কবি। একটি সুন্দর কল্যাণমুখী মন নিয়ে তাঁর মনের মতো সমাজকে তিনি কেবলই খুঁজে বেড়াতেন এ দেশে। বলেন তিনি, "আমি আমার এই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক দেখে যেতে চাই আমার জীবদ্দশাতেই।"[৬১] এই যে তাঁর দেশের দারিদ্র্যমুক্তি ইত্যাদির কামনা, তাঁর সাহিত্য সাধনার সে গণমানুষমুখী বৈশিষ্ট্যকেই আবার নির্দেশ করে। সে সাধনায় রত থেকে তিনি তাঁর কবিতার এক বড়ো অংশকে এ দেশের কেবল গণমানুষের ইতিহাস নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক বিশেষ আর্কাইভে পরিণত করেছেন।

---

[১] জীবন ও জগৎ নিয়ে তাঁর রোমান্টিক ভাবনার মূলে ছিলো কখনো বাস্তবে ওইসবে তাঁর ঈপ্সিত সুন্দর রূপটির অপ্রাচুর্য; তার ফলে উদ্ভূত আফসোস বা ক্ষোভ তাকে আরও একটু পরিণত বয়েসে আর্থ-সমাাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবেশ-প্রেক্ষাপট ও তার সংলগ্ন সাধারণ মানুষ সচেতন করে তোলে।

[২] 'কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি' নামের একটি কবিতা রয়েছে কবি শামসুর রাহমানের, 'নিজবাস ভূমে' নামের কাব্যগ্রন্থে, যার একটি লাইন হলো: "তবু আপনার মতো কারুকেই চাই, চাই আজও নজরুল ইসলাম।"

[৩] আবুল আহসান চৌধুরী, 'শামসুর রাহমান: অন্তরঙ্গ আলাপ' অন্তর্গত, *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০), পৃ. ৩২৫।

[৪] শামসুর রাহমান, "গর্জে ওঠো স্বাধীনতা," 'গৃহযুদ্ধের আগে,' *কবিতাসমগ্র* ২ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ১৬৯। উল্লেখ্য, 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' নামক কবিতাটি সম্পূর্ণত তাকে নিয়ে লেখা।

[৫] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা* (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২২৩।

[৬] Shamsur Rahman, "The Obligation of a Poet," Included, *Literature in Bangladesh/Contemporary Bengali Writing: Bangladesh Period*, Khan Sarwar Murshid edited (Dhaka: University Press Limited, 1996), p. 257.

[৭] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার (সম্পা.), বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (পরিমার্জিত সংস্করণ; ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২), পৃ. ৩৩৯।

[৮] https://www.merriam-webster.com/dictionary/mass

[৯] শামসুর রাহমান, "কয়েকটি দিন: ওয়াগনে," অন্তর্গত, *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে শামসুর রাহমান*, ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন সম্পা. (ঢাকা: মাওলা ব্রদার্স, ২০০৬), পৃ. নম্বর নেই (৩০৬ পৃষ্ঠার পরে)।

[১০] শামসুর রাহমান, "আনাড়ি," 'এক ধরনের অহংকার,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ১৫৩-১৫৪।

[১১] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা* (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২২৩।

[১২] শামসুর রাহমান, *কবিতা এক ধরনের আশ্রয়* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৩১।

[১৩] বঙ্গবন্ধুর একান্ত ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোদ্ধা, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পরবর্তী কালে যিনি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হন। দ্রষ্টব্য: শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা* (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২৮২।

[১৪] শামসুর রাহমান, "কয়েকটি দিন: ওয়াগনে," অন্তর্গত, *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে শামসুর রাহমান*, ভূইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন সম্পা. (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৩০৬-৩০৭। উল্লেখ্য এখানে, তাঁর প্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম প্রফেসর অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে তিনি মানবতার শিক্ষা বিশেষভাবে পেয়েছিলেন, যিনি 'কয়েকটি দিন: ওয়াগনে' কবিতাটি লেখার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কবিকে। সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি ৩০৫-৩০৬ পৃষ্ঠার মধ্যে বা কবির *কালের ধুলোয় লেখা* শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে রয়েছে। কবিতাটি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

[১৫] শামসুর রাহমান, "কড়া নেড়ে যাবে," 'হোমারের স্বপ্নময় হাত,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৬৪২।

[১৬] শামসুর রাহমান, "খুপরির গান," 'রৌদ্র করোটিতে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ২১৬।

[১৭] শামসুর রাহমান, "তিনটি বালক," 'রৌদ্র করোটিতে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ২২৩।

[১৮] শামসুর রাহমান, "শুচি হয়," 'মঞ্চের মাঝখানে,' *কবিতাসমগ্র ২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ২২৯।

[১৯] শামসুর রাহমান, "পুরুষানুক্রমে," 'সে এক পরবাসে,' *কবিতাসমগ্র ২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ৪৩৮।

[২০] শামসুর রাহমান, "কুমোর," 'এক ফোঁটা কেমন অনল,' *কবিতাসমগ্র ৩* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৩৯৬।

[২১] শামসুর রাহমান, "মে দিনের কবিতা," 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৫৫৫।

[২২] শামসুর রাহমান, "আমার পিতার গ্রাম," 'ঝরনা আমার আঙুলে,' *কবিতাসমগ্র ২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ৫১৫।

[২৩] উদ্ধৃত, অনীক মাহমুদ, "তাঁর কবিতায় গণচেতনার রূপায়ণ," অন্তর্গত, নির্জনতা থেকে জনারণ্যে শামসুর রাহমান, ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন সম্পা. (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ১৬৬।

[২৪] শামসুর রাহমান, "এ শহর," 'নিজ বাসভূমে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৩১৫।

[২৫] শামসুর রাহমান, "তিনশো টাকার আমি," 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যু আগে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৫৯।

[২৬] শামসুর রাহমান, "প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে,"প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ২২।

[২৭] শামসুর রাহমান, "বিরস গান," 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৩৯।

[২৮] শামসুর রাহমান, "স্যামসন," 'দুঃসময়ে মুখোমুখ,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৬৩-৬৪।

[২৯] শামসুর রাহমান, "এ-ও তো বাংলাই এক," 'এক ধরনের অহংকার,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ১১২-১১৩।

[৩০] শামসুর রাহমান, "চাঁদ সদাগর," 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ৫০২।

[৩১] শামসুর রাহমান, "গুড মর্নিং বাংলাদেশ," 'অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই,' *কবিতাসমগ্র ৩* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ২৭৮।

[৩২] শামসুর রাহমান, "খাঁ খাঁ দীপাধার," 'যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে,' *কবিতাসমগ্র ২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ৫৩০।

[৩৩] শামসুর রাহমান, "চাঁদ সদাগর," 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৫০১।

[৩৪] শামসুর রাহমান, "আমৃত্যু আমার সঙ্গী কবিতার খাতা," 'আমার কোনো তাড়া নেই,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৬২২।

[৩৫] শামসুর রাহমান, "দেবে না, তোমরা দেবে না," 'আমরা ক'জন সঙ্গী,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৭১৭।

[৩৬] শামসুর রাহমান, "প্রামাণ্য চিত্রের অংশ," 'স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার,' *কবিতাসমগ্র ২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ৩৩। ১৯৪৯ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপরা ওয়ার্ডে কমিউনিস্ট কয়েদিদের গুলি করে হত্যা করা হয়। আহতদের মধ্যে কমরেড আবদুস শহীদ ছিলেন।

[৩৭] শামসুর রাহমান, "শুচি হয়," 'মঞ্চের মাঝখানে,' *কবিতাসমগ্র ২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ২২৯।

[৩৮] শামসুর রাহমান, "গর্জে ওঠো স্বাধীনতা," 'গৃহযুদ্ধের আগে,' *কবিতাসমগ্র ২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ১৬৯।

[৩৯] শামসুর রাহমান, "তোমাদের মুখ," 'হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৯৮।

[৪০] শামসুর রাহমান, "লানতের পঙ্‌ক্তমালা," 'হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৯৩।

[৪১] শামসুর রাহমান, "পুরাণের পাখি," 'হরিণের হাড়,' *কবিতাসমগ্র ২* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ৬৭৮।

[৪২] শামসুর রাহমান, "পান্থজন," 'এক ফোঁটা কেমন অনল,' *কবিতাসমগ্র ৩* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৩৯৭।

[৪৩] শামসুর রাহমান, "সফেদ পাঞ্জাবি," 'দুঃসময়ে মুখোমুখি,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ১০১।

[৪৪] শামসুর রাহমান, "যদি ইচ্ছে হয়," 'রৌদ্র করোটিতে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ২৪০।

[৪৫] শামসুর রাহমান, "পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ," 'রৌদ্র করোটিতে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ২২১।

[৪৬] শামসুর রাহমান, "বন্দি শিবির থেকে," 'বন্দি শিবির থেকে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৩২৬।

[৪৭] শামসুর রাহমান, "স্বাধীনতা তুমি," 'বন্দি শিবির থেকে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৩২৯।

[৪৮] শামসুর রাহমান, "বেশ ভালোই তো," 'খুব বেশি ভালো থাকতে নেই,' *কবিতাসমগ্র ৩* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৫৩৫।

[৪৯] শামসুর রাহমান, "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা," 'বন্দি শিবির থেকে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৩২৭।

[৫০] শামসুর রাহমান, "গ্রামীণ," 'বন্দি শিবির থেকে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৩৬৩।

[৫১] উল্লেখ্য, প্রকাশকালে 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের লেখকের নাম ছিলো 'মজলুম আদিব'। মজলুম মানে অত্যাচারিত। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ্য, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে নিয়ে তার একটি কবিতা রয়েছে, কবিতাটির নাম 'সফেদ পাঞ্জাবি'।

[৫২] শামসুর রাহমান, "ধন্য সেই পুরুষ," 'অবিরল জলভ্রমি,' *কবিতাসমগ্র ৩* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪৭৬।

[৫৩] শামসুর রাহমান, "আক্রান্ত হ'য়ে," 'দুঃসময়ে মুখোমুখি,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৮৬।

[৫৪] শামসুর রাহমান, "কালো মেয়ের জন্যে পঙ্‌ক্তিমালা," 'অবিরল জলভ্রমি,' *কবিতাসমগ্র ৩* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪৭৯।

[৫৫] শামসুর রাহমান, "প্রাত্যহিক," 'বন্দি শিবির থেকে,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৩৩৪।

[৫৬] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা* (দ্বিতীয় মুদ্রণ: ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২২৩।

[৫৭] শামসুর রাহমান, "শ্রমিকের মতো," 'ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই,' *কবিতাসমগ্র ৩* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৩৫৯।

[৫৮] "যাতে আমার/মুক্ত কণ্ঠস্বর বিজর হাওয়ায় হারিয়ে যায়, সেজন্যে ওদের/ষড়যন্ত্রের অন্ত নেই; তবু আমার বাঁচার সাধ সতেজ।" দ্রষ্টব্য: শামসুর রাহমান, "বেঁচে থাকতে চাই," 'ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ১৭৮।

[৫৯] শম্ভু মিত্র, "শামসুর রাহমানের কবিতা," অন্তর্গত, মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, শামসুর রাহমান সংখ্যা (ঢাকা: ১৯৯১), পৃ. ২৬৫।

[৬০] Manabendra Bandyopadhyay, "A witness of time," অন্তর্গত, *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে শামসুর রাহমান*, ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন সম্পা. (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৩০৮।

[৬১] আবুল আহসান চৌধুরী, "শামসুর রাহমান: অন্তরঙ্গ আলাপ," অন্তর্গত, *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০), পৃ. ৩৩০।

[Manuscript received on 19 October, 2023; accepted on 15 December, 2023]